



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 352 - 367

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মতি নন্দীর ‘স্ট্রাইকার’ : একজন ফুটবলারের নেপথ্যকথা

পর্ণা মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা

Email ID: parna.bengali@tripurauniv.ac.in



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Writer Moti Nandi, Sports journalist, Lower middle class, Footballer, Striker, Teenage character, Playground, Field of life, Motivational.

Abstract

Writer Moti Nandi, who was a renowned sports journalist by profession, has a notable sports novel called ‘Striker’. In a lower-middle-class family, son Prasun responds to his father’s unfair humiliation on the football field. Twenty-four chapters of the novel depict the main character Prasun’s struggle for success and establishment in the world of football. Many people in the neighborhood have come and gone on the difficult path of realizing Prasun’s dream. Similarly, the role of other characters has been discussed and the fact that the story is named ‘Striker’ has also been discussed. Twenty-four chapters of this novel are reviewed in detail. Moti Nandi’s craft as a whole is explained. Prasun, the central young character, despite facing many hardships of life due to his tender age, did not turn back from the field of struggle. How he raised his head and took revenge for the humiliating incident with his father is evident in the events of the novel. In the lower-middle class family, the child’s desire to be established, but the injury to the sense of values, the injury from the environment, etc., and Prasun’s transformation from a striker in the playground to a striker in the field of life, is analyzed in real life and literature. The novel is a collection of the untold story of a footballer becoming a footballer. Moti Nandi published the novel ‘Striker’ in 1972. Today in the second decade of the 21st century and even in the coming days, the novel is full of special motivational elements of human life.

Discussion

ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা বাঙালির চিরকালীন প্রবণতা। সবুজ মাঠের প্রত্যক্ষ খেলা আর বই-এর সাদা পাতায় অক্ষরে আঁকা খেলা তার বিভেদ দূর করে দিয়ে প্রমাণ করে, লেখক কতটা ক্রীড়াপ্রেমী। পেশা আর ভালোবাসার যেখানে মেলবন্ধন, সেখানে তা থেকে সার্থক সৃজনশীলতা অবশ্যই কাম্য। মতি নন্দীর ক্ষেত্রেও এমনটা নজর কাড়ে। কারণ, লেখক মতি নন্দী পেশায় একজন সুবিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক ছিলেন।

১৯৮০ মস্কো এবং ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিক গেমস ছাড়াও দেশবিদেশ থেকে চৌত্রিশটি ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের বিবরণ পাঠিয়েছেন। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখেছেন, খেলাকে গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রে নিয়ে সাহিত্যের এক প্রাণবন্ত অনন্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে। তাঁর ‘স্ট্রাইকার’ এমনই একটি উপন্যাস। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় ‘স্ট্রাইকার’। অভাব-অনটন স্বপ্নপূরণের কন্টকাকীর্ণ পথের অন্তরায় না হয়ে, কিভাবে বাবার প্রতি হওয়া বিগত অন্যায়ের প্রতিশোধের শক্তি হয়ে উঠল, ফুটবলার প্রসূনের বয়ানে সেই কাহিনিই ‘স্ট্রাইকার’। ১৯৭৮ সালে অর্চন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন হয় ‘স্ট্রাইকার’ নামেই।

দুই

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে স্বপ্নের উদ্ভব অবচেতনে জমে থাকা ভাবনা। প্রসূনের চেতন-অবচেতন জুড়ে বড় ফুটবলার হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল বলেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ধরা দেয় জীবনের স্বপ্ন। দেশের সীমানা পেরিয়ে তাই ব্রাজিল থেকে স্যানটোস ফুটবল ক্লাবের ম্যানেজার স্বয়ং এসেছেন প্রসূনকে তাঁদের ক্লাবের হয়ে খেলার প্রস্তাব দিতে। প্রসূনের বয়স সতেরো বছর চার মাস অর্থাৎ সে নাবালক। তাই স্যানটোস ফুটবল ক্লাবের ম্যানেজার প্রসূনের বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্য। অনিল ভট্টাচার্যের দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে প্রসূন। অনিল ভট্টাচার্যের ফুটবল খেলার ইতিহাস আর স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব যন্ত্রণা ধরা দিল প্রসূনের স্বপ্নের কাহিনির বয়ানে। এছাড়াও প্রতিবেশী নুটুদা, নীলিমা, বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ দত্তদের বাস্তব পরিচয়ও উঠে এল সেই স্বপ্নেই।

“নুটুদা আমাদেরই পাশের ঘরের আর এক ভাড়াটে। ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করেন। বছর দুয়েক আগে গুঁর স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারে একমাত্র মেয়ে নীলিমা ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষটি অতি সরল, সাদামাটা, দোষের মধ্যে অযাচিত উপদেশ দেন, বারোয়ারী একটা কিছুর, রবীন্দ্রজয়ন্তী বা শীতলা পুজোর সুযোগ পেলেই চাঁদা তুলতে শুরু করেন। ছেলেবুড়ো সবাই ওকে নুটুদা বলে ডাকে।”^১

নুটুদার মেয়ে নীলিমার উপন্যাসের আবর্তনের শেষ পর্যন্ত অনুঘটকের মতো উপস্থিতি। প্রসূনের প্রায় সমবয়সী, ক্লাস টেনে পড়া কঠোর পরিশ্রমী মেয়ে নীলিমা। নুটুদাই বিদেশীকে প্রসূনদের বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে আসে। সঙ্গে আছে পাড়াভূতো অজস্র কৌতূহলী চোখের ভিড়। ভীরা প্রকৃতির বাড়িওয়ালা বিশ্ববাবু ওরফে বিশ্বনাথ দত্ত এমন ভিড় তাঁর বাড়িতে আসতে দেখে বাড়ি থেকে বার হতে গিয়েও পুলিশ ভেবে ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন।

“বাবা ঘরে চৌকিতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মা রান্নাঘরে। আমরা দুই ভাই এক বোন। আমার পর পিন্টু, তারপর পুতুল। ... বাবা গস্তীর প্রকৃতির, অত্যন্ত কম কথা বলেন। অধিকাংশ দিন আমার সঙ্গে তো একটাও কথা হয় না। আমি গুঁকে এড়িয়ে চলি।”^২

প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্যের ফুটবলার জীবনের চরম আঘাত তাঁকে ফুটবল সম্বন্ধে নির্বিকার করে তুলেছে। তাই ফুটবলের রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাওয়া পেলের নাম শুনেও যেন বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছতে পারছেন না, এমন প্রতিক্রিয়া দেন। এমনকি ছেলেকে খেলানোর অনুমতি দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

“না। আমি ফুটবল খেলার কোন কিছুতে সহি করব না। আমি ছেলের সর্বনাশ করে তার অভিষাপ কুড়োতে চাই না।”^৩

ফুটবল খেলার সমার্থক ‘সর্বনাশ’ যিনি বলছেন, তাঁর মনস্তাত্ত্বিকতা বিচার করা প্রয়োজন। ঠিক কোন আঘাত থেকে তিনি এমন মনোভাব পোষণ করছেন, কোন ক্ষত তিনি বয়ে চলেছেন, তা কাহিনির বয়ানে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রারম্ভিক উপস্থাপনায় আছে বিশেষ অভিনবত্ব। কারণ, এই সব তথ্যই উঠে আসছে প্রসূনের স্বপ্নের মাধ্যমে। আসলে এ স্বপ্ন অলীক কোন স্বপ্ন নয়, এ স্বপ্ন বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। বিদেশীকে নুটুদা ফিসফিস করে বলেছিলেন—

“অনিলবাবু একসময় ফুটবল খেলতেন। কলকাতার সব থেকে বড় টিম যুগের যাত্রীর দুর্ধর্ষ লেফট-ইন ছিলেন। তারপর রোভারস খেলতে গিয়ে বাঁ হাঁটুতে চোট লাগল, খেলা ছেড়ে দিলেন।”^৪

এই খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে অনিলবাবু প্রতিবাদী স্বরে বলে উঠেছিলেন, তিনি খেলা ছাড়েননি, বরং ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অনিল ভট্টাচার্যের কপালের ঠিক মাঝ বরাবর টিপের মতো কাটা দাগটা সেই খেলা ছেড়ে যাওয়ার

দিনের ভয়াবহতার স্মৃতি বহন করে। ময়দানের রাজনীতির হিংস্ররূপ মনে ও দেহে বহন করে চলেছেন যিনি, নিজের ছেলেকে তিনি সেই আশঙ্কায় সেই পথে নিজের হাতে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করবেন, সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে মানুষটা সেই আঘাতের পর সেইদিনের কথা নিয়ে চর্চা করেননি, বরং স্বল্পভাষী হয়ে যন্ত্রণা নিজের মধ্যেই বহন করে চলেছেন, তিনি হঠাৎই সেদিনের কথা বলে ফেললেন। উপন্যাসে এই বাস্তব তথ্যও উঠে এসেছে স্বপ্নেরই বুননে। যেখানে প্রসূনের বাবাকে সেই শেষ মাঠে নামার দিন জোর করে ইনজেকশন দিয়ে শরীর খারাপ চাপা দিয়ে মাঠে নামতে বাধ্য করা হয়। মাত্র ছয় গজ দূর থেকেও গোলপোস্টে বল দিতে অপারগ হন। ক্ষত তরুণাঙ্ঘি চিকিৎসার জন্য কোনো অর্থ প্রদান তো করেইনি ক্লাব, উপরন্তু খেলতে বাধ্য করিয়ে পরিশেষে খেলা ছাড়তেও বাধ্য করে ক্লাব। তবে, এক্ষেত্রে খেলতে বাধ্য করার সময় চাকরির প্রলোভন দিয়েছিল ক্লাব। আসলে, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য খেলার পাশাপাশি চাকরির বড় প্রয়োজন। তাই অনিল ভট্টাচার্যের মনে কোথাও চাকরির হাতছানি মাঠে নামার বাধ্যবাধকতায় নামমাত্র ইতিবাচকতা আনলেও তা অন্যায্য নয়। কারণ শুধুমাত্র সংসার যাপনের জন্যই নয়, একজন খেলোয়াড়ের প্রাথমিক শর্ত— সঠিক পুষ্টি। তাই চাকরির বড় প্রয়োজন। অনিলবাবু সর্বস্ব দিয়ে দলকে জেতানোর চেষ্টা করেও শেষে ব্যর্থ হন। প্রতিদানে অনিলবাবু যা পেয়েছিলেন দলের কাছ থেকে—

“আমার সারা মুখে থুথু দিয়ে ওরা বলল, ঘুম খেয়েছি। বাড়ি ফেরার সময় মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।”^৫

সেখানেই প্রসূনের বাবা কুড়ি বছর আগে ফুটবলার জীবনের ইতি। তারপর অরুণা গ্লাস ফ্যান্টাসিরিতে টাইম কীপারের কাজ করতে শুরু করেন। সেখানে কাহিনির বর্তমান সময়ে তিন মাসের ওপর লক আউট চলছে। কিন্তু অসম্ভব আত্মসম্মানবোধ তাঁর। বাড়ি ভাড়ার পঁয়ত্রিশ টাকা ও অন্যান্য সংসার খরচের জন্য ওষুধের দোকানে কাজ করছেন। দুপুর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন। যে ফুটবল অনিলবাবুর সমূহ সর্বনাশ করেছিল, সেই ফুটবলেই ছেলের আগ্রহ, ছেলের সামনে সুবর্ণ সুযোগের হাতছানি। বিদেশী দল প্রসূনকে প্রাথমিক মাসিক ভারতীয় মূল্যে দুই হাজার টাকা এবং পরবর্তীতে বছরে খেলা, বোনাস, বিজ্ঞাপন মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা রোজগারের হিসেব দেয়। বিদেশী চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দিয়ে একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা দিলেন প্রসূনের বাবাকে। প্রসূনের বাবা কার্ডটি টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন উঠানে শিউলি ফুলের মতো। প্রসূনের মা এবং নুটুদার মেয়ে নীলিমা কার্ডের টুকরোগুলি কুড়োচ্ছে— এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রসূনের ঘুম ভাঙে নীলিমার ডাকে ভোর পাঁচটায়। এখানেই পরিসমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং প্রসূনের স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও জীবনের স্বপ্ন হয়ে ধ্বলম্বল হয়ে উঠেছে।

‘স্ট্রাইকার’ উপন্যাসটিকে মতি নন্দী সর্বমোট চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে সকালে শোভাবাজার ইউনিয়নের মাঠে প্রসূন, নিমাই আর আনোয়ারের ট্রায়াল দিতে যাওয়ার কথা। প্রসূনদের বাড়িতে ঘড়ি নেই। তাই সে নীলিমাকে ডেকে দিতে বলেছিল ভোর পাঁচটায়। নীলিমা পরিশ্রমী মেয়ে। মায়ের অবর্তমানে নীলিমা খুব ভোরে উঠে জল তুলে, উনুন ধরিয়ে বাবার জন্য ভাত রান্না করে তারপর স্কুলে যায়। ঘুম ভেঙে প্রসূনের মনে হয় তার পেলে হওয়ার স্বপ্নের কথা। স্বপ্ন যতই স্পর্ধা হোক না কেন, তাকে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখলেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই নতুন উদ্যমে ট্রায়ালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় প্রসূন। প্রসূনের ফুটবলার হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন হর্ষদা। আসলে, আত্মপ্রতিভা সম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরের দৃষ্টিতে সেই আবিষ্কারেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

“হর্ষদাই প্রথম আমায় বলেন— প্রসূন, তোমার মধ্যে ফুটবল খেলা আছে, মন দিয়ে খেলো, বড় হতে পারবে।”^৬

সম্ভাবনা থাকলেও আদর্শ ফুটবলার হতে গেলে তাকে তার অজস্র খামতিকে উত্তীর্ণ করতে হবে, একথা জানে প্রসূন। সে আত্মসমীক্ষায় জানে তার ডান পায়ে প্রচণ্ড শট কিন্তু বাঁ পা সেই তুলনায় ভালো চলে না। বল নিখুঁতভাবে ট্র্যাপ করতে পারে না সে, এমনকি হেড করার সময় চোখ বুঁজে কুঁকড়ে যায়। সত্তর মিনিট খেলার মতো দম তার নেই সে জানে। তাই প্রসূন খেলা শিখতে চায়, খেলার খুঁটিনাটি কৌশল রঙ করতে চায়, অনুশীলন করতে চায় সঠিকভাবে ফুটবল। কিন্তু খেলার

জন্য যে চাই যথাযথ পুষ্টি এবং অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ক্ষুধা নিবারণ। অথচ বাড়ির অর্থনৈতিক পরিবেশে দিনে সবার সর্বমোট ছয়টির বেশি রুটি জোটে না। তাও খিদেপেটে খেলা সম্ভব নয় বলে মাকে প্রসূন তার জন্য দু'খানা রুটি রাখতে বলেছিল। সকালে দেখে মা তার জন্য চারখানা রুটি রেখেছেন। প্রসূনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তার মা নিশ্চয় বিগত রাতে নিজে না খেয়ে ছেলেকে খেলতে পাঠানোর জন্য রুটি রেখে দিয়েছেন। সম্ভানের জন্য পিতা-মাতার আত্মত্যাগ চলতে থাকে প্রচ্ছনে। লম্বায় আট ফুট আর চওড়ায় পাঁচ ফুটের ঘরে প্রসূনের স্বপ্ন সীমাবদ্ধ থাকে না। সবুজ ময়দানে সেই স্বপ্ন ফুটবলে পা রেখে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে চায়। সদাহাস্য, স্বপ্নভাষী মায়ের আশীর্বাদ নেয় প্রসূন। বাবার সঙ্গে কথা না হলেও মায়ের কাছে খোঁজ নেয় সে। হর্ষদা বিপিন সিংহকে প্রসূনের কথা বলে রেখেছেন। প্রসূনের মনে হয়—

“যদি বিপিন সিংহের পছন্দ হয়, তাহলে ময়দানের ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ আসবে। ফুটবল আমার কাছে রূপকথার একটা প্রাসাদ। যে আশা মনে মনে বহুদিন ধরে লালন করে আসছি, আজ তার দরজায় পৌঁছতে যাচ্ছি মাত্র। যদি ঢুকতে পারি তাহলে এক-একটা তলা নীচে ফেলে উপরতলায় উঠবই, উঠতেই হবে। সে জন্য যত পরিশ্রম করা দরকার করবই।”^৭

এরপর সংখ্যা নামাঙ্কিত তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে প্রসূনের স্বপ্নের সিঁড়ি অন্বেষণ। সে জানে একদিন খেলে বিখ্যাত হয়ে ও টাকা উপার্জন করতে হলে এবং বড় দলে খেলতে হলে, প্রাথমিকভাবে শোভাবাজার ইউনিয়নে খেলে খ্যাতি অর্জন করতে হবে। তারপর খেলার মান দিয়ে নজর কাড়তে পারলে তবেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা যুগের যাত্রীর মতো বড় দলে খেলার সুযোগ আসতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই যুগের যাত্রীই তার বাবা অনিল ভট্টাচার্যের জীবনে ‘ফুটবল’ আর ‘সর্বনাশ’—এই দু’টি শব্দকে সমীকৃত করে তুলেছে। অন্যদিকে, প্রসূনের দুই বন্ধু নিমাই আর আনোয়ারের পূর্বপুরুষ কেউ খেলতেননা। ক্লাস ফাইভে ফেল করার পর আর স্কুলে যায়নি নিমাই, শান্তিপল্লী নামক জবরদখল কলোনীতে থাকে। বাবা নেই, হাতিবাগানে দাদার কাপড়ের দোকান। অন্যদিকে আনোয়ারের পরিবার বেশ অবস্থাপন্ন। ছয় ফুট লম্বা, পঁয়ষটি কেজি ওজন ও টকটকে রঙের আনোয়ারের বাবা একটি হোটেল এবং দুইটি বস্তির মালিক। পড়াশুনাও চালিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আনোয়ার; পাট ওয়ান কমার্সের ছাত্র সে, বাসে বাসে বাবার কথা মনে করে প্রথমে অভিমান হয়েছিল প্রসূনের, বাবা কেন তার খেলার বিষয়ে খোঁজ খবর নেননা অথবা কোনো পরামর্শ দেননা ভেবে। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই বাবার ইতিহাস তরতাজা হয়ে ওঠে ওর মনে, মনে পড়ে, মা’কে বলা বাবার সেই কথা—

“ফুটবল আমাকে ফোঁপরা করে দিয়েছে, খোকাকেও দেবে। ওকে বারণ করো।”^৮

বাবার প্রতি হওয়া অন্যায় প্রসূনকে স্বপ্নবিমুখ না করে উপরন্তু স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত করল। তবে প্রথমদিনই ট্রায়ালে এসে মাঠের বাস্তবছবি কিছুটা আশাহতও করল তাকে। বিপিনদাকে খুশি করার জন্য দলের অনেকেই কম দৌড়ে টিউবওয়েল থেকে জল জামায় মুখে পায়ে ও গায়ে ছিটিয়ে ঘর্মান্ত হওয়ার অভিনয় করল। এটি তারা প্রতিনিয়ত করে থাকে। যে ছেলোটো পরিশ্রম করতে গেল, খেলার কৌশল রপ্ত করতে গেল, তার কাছে এমন দৃশ্য মাঠ সম্পর্কিত মোহ ভেঙে দিল। এছাড়াও আছে নবাগতদের প্রতি পুরানো সদস্যদের বিদ্বেষ উদ্বেকজাত রাজনীতি। যদিও শেষপর্যন্ত হর্ষবাবুর কাছ থেকে আসা তিনজন নবাগতদের পরখ করতে চাইলেন বিপিনবাবু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রসূন দেখল গড়ের মাঠের রাজনীতি আর হতোদ্যম হতে গিয়েও স্বপ্নপ্রদীপটিকে দুইহাতে আগলে রাখার চেষ্টা করল সে। আনোয়ারের বিরাট শট বিপিনকে মুগ্ধ করে। নিমাই আর প্রসূন মনে করে আনোয়ার বুঝি একমাত্র নির্বাচিত বিপিনদার চোখে। কিন্তু শোভাবাজার ইউনিয়নে এসে খেলার স্কিল শেখার যে বাসনা প্রসূনের ছিল, তাতে জল ঢেলে দিয়ে বিপিন বলেছিলেন, -

“স্কিল লাগে যারা চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট করে—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী এদের। আমরা ফাইট করি রেলিগেশন, নেমে যাওয়া আটকাতে। স্কিল আমাদের কী দরকার?”^৯

যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে লাগল প্রসূন বিপিনের সঙ্গে। কিন্তু ফুটবলের স্কিল সংক্রান্ত কোনো ইতিবাচকতা দেখতে না পেয়ে দেখল মাঠের নেতিবাচকতা— পারস্পরিক আঘাত, বাগড়া, হাসাহাসি, গালিগালাজ ইত্যাদি। কেউ কাউকে কনুই দিয়ে

নাকে আঘাত করেছে, কেউ কারোর প্যান্ট ধরে এমনভাবে নামিয়ে দিয়েছে যে, গোলের চেয়ে যেন লজ্জানিবারণই মুখ্য হয়ে ওঠে, আনোয়ারের তলপেট হাঁটু দিয়ে আঘাত করে পলাশ টিকাদার। এই পলাশ টিকাদার সম্পর্কে জানতে পারে—

“ডেনজারাস ছেলে গত বছর রেফারীকে চড় মেরেছিল, একজনের পা ভেঙে দিয়েছে, টাকা খেয়ে সেমসাইড গোল করে ম্যাচ হারিয়েছে, স্টেট থেকে একবার চারটে টেরিলিন ফুলপ্যান্ট একসঙ্গে চুরি করেছে।”^{১০}

এইসব প্রত্যক্ষ করে প্রসূন বাড়ি ফেরে। মা বা নীলিমাকে এই বাস্তবের সম্মুখীন করে তাদের ফাস্ট ডিভিশন সম্পর্কিত আকাশছোঁয়া ধারণাকে ভেঙে দিতে চায়নি প্রসূন। নবাগত ফুটবলারের ক্ষেত্রে আরও একটি যন্ত্রণার বিষয় হল— টিমে সুযোগ পেয়ে তৈরি হয়ে বসে থেকেও মাঠে নামতে না পারা। চোখের সামনে একের পর এক ম্যাচ খেলে চলেছে দুই বন্ধু, দলের পরাজয়ও ঘটছে, প্রসূন অসহায় হয়ে ওঠে। শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন রাজস্থানের সঙ্গে খেলার আগের দিন নোটিশ বোর্ডে টিমের লিস্টে নিজের নাম দেখে প্রসূন, সেখানেও পরীক্ষা; প্রকৃতির পরীক্ষা।

“লিস্ট-এ এগারোজনের নামের মাথায় লেখা ‘ইফ নট রেইন’। আমার নাম ‘ইফ নট রেইন’-এর তালিকায়।”^{১১}

অর্থাৎ বৃষ্টি না হলে খেলবে প্রসূন আর বৃষ্টি হলে খেলবে সেই পলাশ টিকাদার। এতদিন খোলা মাঠে প্রসূন খেলেছে নিজের মতন। প্রথমবার ঘেরা মাঠে বহু দর্শকের সামনে খেলার সুযোগেরও নিশ্চয়তা নেই। সবটাই প্রকৃতির হাতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এসেছে প্রসূনের খেলতে পারা বা না পারার চিন্তাসূত্রে পূর্ববর্তী চাতরায় ফাইনাল খেলার আগের দিনের স্মৃতি। অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড; ‘ল্যান্টা মন্টে’ নামেই পরিচিত ব্যক্তিটি খেলতে নামার আগে ঠাণ্ডায় সাঁতার কেটে ফিট হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, মূল খেলার দিন কোনরকম প্র্যাকটিস না করে শুধুমাত্র সকালে সাঁতার এবং দুপুরে বিশ্রাম ও ঘুম ভালো খেলার জন্য অপরিহার্য। এরপর আনোয়ারকে প্রসূন সাঁতার কাটতে বললে আনোয়ার জানায় সে গঙ্গা তো দূরে থাক, চৌবাচ্চায় পর্যন্ত সাঁতার কাটেনি। সুতরাং প্রসূন মন্টেদার কথা মতো গঙ্গায় সাঁতার কেটে ফিরে ভাত-মাংস খেয়ে ঘুমায়, বিকেলে ম্যাচ। কিন্তু সাঁতার কেটে খেলার জন্য উপযুক্ত অনুভব করার বদলে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে প্রসূনের। গোলের সম্ভাবনাময় সুযোগও হাতছাড়া করে। এক অর্থে সে খেলতেই পারে না সেদিন। তাই সেই দিনের কথা চিন্তা করে পুনরায় সে বৃষ্টি না হওয়ার প্রার্থনা জানায়। কারণ সে ‘ইফ নট রেইন’-এর তালিকাভুক্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদে ম্যাচের সকাল আর সারাদিন। রাতে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে নীল রঙ দেখা দিয়েছে, অনেকটা মেঘ কেটে গেছে। প্রসূন তার মাকে খেলার খবর আর খাওয়ার আর্জি জানাতে গিয়ে অনুভব করল মা নির্বিকার। আসলে অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন দিনে কয়েকটা রুটি ছাড়া যে পরিবারের সম্বল নেই, সেখানে খেলোয়াড়ের উপযোগী ও যথাযথ খাবারের অভাব—প্রসূনের নিজের প্রতিই ক্ষোভ বাড়িয়ে দেয়। মাধ্যমিকে ফেল করার পর ফুটবলে মন-প্রাণ সমর্পণ করে প্রথাগত পড়াশুনা ছেড়ে দেয় প্রসূন। তার মনে হয় তারই উচিত ছিল পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করা। কিন্তু ফুটবল খেলে নাম না করলে তা সম্ভব নয়। শোভাবাজার ইউনিয়নে ফুটবলের স্কিল শিখবে বলে ধাক্কা খাওয়া প্রসূন ভাই পিন্টু ও ভাইয়ের বন্ধুদের রেখে সচল মানুষের সঙ্গে ড্রিবল করা অনুশীলন করে। ভাই পিন্টুর কাছে দাদা প্রসূন হিরো, তাই যখন পিন্টুর বন্ধুরা মাঠের সত্য তুলে ধরে তাকে বলে— আনোয়ার আর নিমাই রোজ খেললেও তার দাদাকে দল বসিয়ে রেখে খেলানি, তখন পিন্টু দাদার খেলার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ডানায় ভর করে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতে পিছপা হয় না। প্রসূনও পিন্টুর ধারণা ভাঙতে না চেয়ে হাঁটুতে চোটের তত্ত্ব বলে। প্রসূনের এখানের অনুভূতি মতি নন্দী ফুটবলের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন—

“ওর কাছে আমি হিরো, আর সেটা বজায় রাখতে মিথ্যে কথাগুলো আপনা থেকেই কেন বেরিয়ে এল, ভেবে পেলাম না। হয়তো ভয়ে। প্রচণ্ড এক স্ট্রাইকার আমার ইজ্জতের ডিফেন্স ভাঙবার জন্য আঘাত হনতে উদ্যত। আমি একটা বিশ্রী ফাউল করে তাকে আটকালাম।”^{১২}

এরপর ভাইকে নিয়ে কারখানার তিনতলা উঁচু দেওয়ালকে গোলপোস্ট কল্পনা করে দাগ দিয়ে ভাগ করে অনুশীলন করে প্রসূন। এই পরিচ্ছেদে আবার এসেছে নীলিমা চরিত্রটি। সে স্কুল থেকে সেই পথে ফিরছিল। নীলিমা প্রসূনের অনুপ্রেরণা। হয়ত বা সেই কারণেই অথবা নিজস্ব অসফলতা থেকে তৈরি জেদের বশে সে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল।

“চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে বলটাকে ব্যাক ভলি করলাম। এভাবে জীবনে কখনো মারিনি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, তিন নম্বর টারগেট-এর মাঝখানে বলটা দুম করে লেগে ফিরে এল। পিন্টু দু’হাত তুলে চীৎকার করে বলটার পিছু ধাওয়া করল। নীলিমার বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেছে, আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমিই প্রসূন ভট্টাচার্য কিনা!”^{১০}

দ্বিতীয়বার আর এমন কেরামতি দেখানোর চেষ্টা প্রসূন করেনা হাঁটু ব্যথার দোহাই দিয়ে। কারণ, তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। এরপর নীলিমার কাছ থেকে অন্যবারের মতো শোধ দেবে বলে পয়সা নেয় প্রসূন। পেটে খিদে নিয়ে খেলা সম্ভব নয়। তাই বসুর দোকানের চারটে কচুরি আর দুটো জিলিপি খেতে চায় প্রসূন। কিন্তু দোকানে খেতে গিয়ে মনে পড়ে, বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া পিন্টুর আজ খাওয়া হয়নি। সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে যায় ভাই এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অনটনের কথা ভেবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ জুড়ে সেই ম্যাচ, বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার উপর যেখানে প্রসূনের খেলা নির্ভর করছিল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে যখন প্রসূনের খেলার সম্ভাবনা কমে আসছিল, সেই সময় অতিরিক্ত ‘আইডিন’ খেয়ে ফেলে নিমাই এর বমি শুরু হওয়ায় তার বদলে বিপিনের নির্দেশে প্রসূনকেই মাঠে নামতে হয়। এরপরই রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলে শোভাবাজারের হয়ে সীজনের প্রথম গোল করে প্রসূন। প্রথম এমন ঘেরা মাঠে খেলে গোল করার পর প্রসূনের অনুভূতি মতি নন্দীর কলমে—

“আমার প্রথম গোল! মাটিতে কাত হয়ে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আর জালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাদামী রঙের ওই গোলাকৃতি বস্তুটা কী নিরীহভাবে বিশ্রাম করছে। আমার সারা পৃথিবী এখন মনে হচ্ছে ওই বলটা। ইচ্ছে করছিল বলটাকে দু’হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরি।”^{১১}

দলের মধ্যেও প্রসূনকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রবল উচ্ছ্বাস। এরপর আছে রতনের কথা। এই রতনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিপিন। দরিদ্র অসহায় বিপিনের চাকরির আশু প্রয়োজন। সেইজন্য বিপিনের কাছে সে খেলার মাঠে নিজের দক্ষতা প্রমাণে মরিয়া। এর ফলে দলের গোলের সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। প্রসূনের দিকে সে বলটাকে নিমাইয়ের মতো এগিয়ে দিলে শেষে গোলের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তার মাথায় কাজ করে চলছিল চাকরির আশ্বাস। খেলার শেষে রতন প্রসূনের কাছে স্বীকার ও প্রকাশ করে আর্জি জানায়। আর্জি হল এই যে—প্রসূন যেন এই মুহূর্তে বিপিনের কাছে চাকরি না চায় কারণ, রতন বুঝে গেছে প্রসূনের খেলা দেখে, চাকরি চাইলে বিপিন রতনের আগে প্রসূনকে ব্যবস্থা করে দেবে। রতনের নিরুপায় স্বীকারোক্তি প্রসূনের কাছে—

“চাকরিটা আমার দরকার! আমার বাড়িতে ভীষণ খারাপ অবস্থা, আমার আগে চাকরিটা দরকার প্রসূন। কথা দাও, তুমি এখানে কিছু চাইবে না। কথা দাও, তুমি এখানে সামনের বছর থাকবে না।”^{১২}

প্রসূন মোহনবাগানের মতো বড় দলে যেতে চায় শুনে রতন জানায় সেও জুনিয়র থাকাকালীন বড় দলে গিয়েছিল। কিন্তু জুনিয়রদের বড়দল বসিয়ে রাখে। ফলে, অনুশীলনের অভাবে খেলা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বড় দলে যাওয়া শ্রেয়। এরপর এক রুট সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় প্রসূনকে রতন। খেলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক দক্ষতা আর শারীরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন যথার্থ পুষ্টি। তাই রতনের ভাষায়—

“...শরীরের যত্ন করো, আরো ওজন বাড়াতে হবে, বাড়ির জন্য ভেবে উপোস দিও না, বরং অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খাবে। গরীবদের নিষ্ঠুর হতে হবে যদি বড় হতে চায়, নয়তো আমার মতন হবে; এই রকম স্বাস্থ্য নিয়ে কি বড় ফুটবলার হওয়া যায়? প্রসূন, দয়ামায়া মমতা বড় ভয়ঙ্কর শত্রু।”^{১৩}

প্রসূন ব্যক্তিগতজীবনে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে চলেছে। তবে সে এতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেও পারেনি। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন, প্রসূন তা অনুভব করেছে, রতনের কথায় আরও অনুভব করল।

উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে আছে প্রসূন-নিমাই-আনোয়ারের সিদ্ধান্তের দোলাচলতা। তারা শোভাবাজার ইউনিয়ন ছাড়তে চায়, বড় দলে যেতে চায়। ফুটবলের আরও কৌশল শিখতে চায়। জুনিয়র বেঙ্গল, জুনিয়র ইনডিয়া টিমে ভবিষ্যতে খেলানোর আশা দেখিয়ে বিপিন মরিয়্যা হয়ে ওঠেন ওদের আর একটা বছর রাখতে। এমনকি প্রচ্ছন্ন হুমকিও বিপিন দেন। কারণ, শোভাবাজারের সেক্রেটারি পরিমল ভটচাজ ফুটবলের ওপরতলার কমিটিতে বেশ ক্ষমতায় আছেন। তাই বিপিনের বক্তব্য, ওনাকে চটিয়ে বড় দলে খেলার চেষ্টা করতে চাইলে, কেয়িয়ারটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। ওরা দুইদিন ভাবার সময় নিল। যে হর্ষদা চরিত্রটি প্রসূনের ফুটবলার সত্তা আবিষ্কার করেছিলেন, সেই হর্ষদার কাছে মানসিক দোলাচলতা নিয়ে প্রসূন উপস্থিত হয়। প্রসূনের হর্ষদা তখন ছাদে ফুল গাছের পরিচর্যা করছিলেন। সবটা শুনে হর্ষ প্রসূনকে মরা গোলাপ ডাল দিয়ে জীবনের সারকথা বোঝালেন—

“ডালটা মরে গেছে, কিন্তু গাছটা দ্যাখ্ কেমন জীবন্ত। অন্য ডালে কতগুলো কুড়িও ধরেছে। এরকম হয়, সর্বক্ষেত্রেই হয়। মানুষ বেড়ে ওঠে আর ফেলে যায় তার মরা ডালপালা। নতুন ডালে ফুল ফোটে। এজন্য পরিচর্যা চাই। সার, জল, রোদের তাপ তাকে দিতে হয়। শিকড় থেকে পাতার মধ্যে দিয়ে সে প্রাণশক্তি আহরণ করে। যদি শিকড় নষ্ট হয়, পরিচর্যা না পায়, তাহলে বাড়তে পারে না। মানুষের শিকড় তার চরিত্র। তুই যদি অনুগ্রহ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বড় হতে চাস তো তোর শিকড় পচে যাবে। ...যার চরিত্র পচে গেছে, সে পারে না। হেরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চ্যালেঞ্জ নানারকম চেহারা নিয়ে আসে, আর মানুষকে তার মোকাবিলা করতে হয়।”^{১৭}

কোনো সিদ্ধান্ত নয় বরং জীবনের এই ধ্বংসাত্মক প্রসূনের কাছে তুলে ধরে হর্ষ ফুটবলার প্রসূনকে জাগিয়ে তুললেন। প্রসূন অন্তরে অনুভব করল সে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। হর্ষদারই একসময়ের শোনানো হেমিংওয়ের একটা গল্প চলার পথে স্মরণ করে সে, -

“মানুষকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করা যেতে পারে না...”^{১৮}

কোন পথে যাবে, চ্যালেঞ্জ নেবে কিনা ইত্যাদি নানান চিন্তায় দিশাহারা প্রসূন দশম পরিচ্ছেদে পায় নীলিমার সুপরামর্শ। হর্ষদার কথায় শিলমোহর দিয়ে নীলিমা প্রসূনকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানসিক দৃঢ়তা এনে দেয়। দিকভ্রান্ত হয়ে প্রসূন রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে শুরু করলে নীলিমাকেও খেয়াল করে না। নীলিমার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রসূন বড় কোনো সমস্যায় আছে, তারপর প্রসূন সবটা স্বীকার করে নিয়ে হর্ষদার কথা বলে এবং তার করণীয় জানতে চাইলে নীলিমা খাঁটি শিক্ষণীয় কথা প্রসূনের উদ্দেশ্যে বলে—

“প্রসূন, যারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বড় হতে পারে না, তারা বড় হবার যোগ্য নয়। প্রসূন; শিক্ষায় যে ফাঁকি দেয় না, সেই একমাত্র বড় হতে পারে। বড় হতে পারে না কাপুরুষেরা। তুমি কি কাপুরুষ, তুমি কি পরিশ্রমে অনিচ্ছুক?”^{১৯}

এমনকি প্রসূনের বাবার উপর হওয়া ফুটবলকেন্দ্রিক অপমানের কথাও আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয় নীলিমা। প্রসূন অনুভব করে বন্ধু বলতে তার জীবনে নিমাই ও আনোয়ার ছাড়া তার মা আর এই নীলিমা।

একাদশ অধ্যায়ে প্রসূনের স্বপ্ন ছুঁতে পারার তাগিদের পথে এসেছে আঘাত-প্রত্যাঘাত। মোহনবাগানের সঙ্গে বড় ম্যাচের খেলার সুযোগ শোভাবাজার ইউনিয়ন তাকে দেয়নি। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, পরের বছর শোভাবাজারে আর না থেকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নই প্রসূনকে তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। নিমাই আনোয়ার দলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তালিকায় তাদের নাম আছে। যে ছেলেটার মাঠে নেমে খেলার কথা, তাকে গ্যালারির দর্শকাসনে বসে খেলা দেখতে হয়। অপরাধ হল ফুটবলের যথাযথ কৌশল শিখতে চাওয়া। এরপর খেলার মাঠের স্বপ্ন বিসর্জন না দিয়েও নতুন কর্মপরিবেশে দেখা যায় প্রসূনকে। হর্ষ চরিত্রটির এক বন্ধুর ভি-আই-পি রোডের বিরাট মোটর সারভিসিং ও পেট্রল ফিলিং স্টেশনে দিনের বেলা মোটর সারভিসিং এর কৌশল শিখে কাজ করতে শুরু করে সে। খেলা বা যে কোনো কাজ—তার

প্রকৃত কৌশল রপ্ত করতে পারাই প্রকৃত দক্ষতা। কিন্তু খেলার কৌশল প্র্যাকটিসে ক্ষতি শুরু হয় সময়ভাবে এবং কর্মব্যস্ততার পর শারীরিক শক্তির অভাবে। এরপর হর্ষের সহযোগিতায় মালিক শিশিরবাবু রাতে পেট্রল ভরার কাজে প্রসূনকে নিযুক্ত করে। ফলে প্রসূন ফুটবল প্র্যাকটিসের সময় পায় এবং রাতে গাড়ি কম আসায় ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করার সুযোগও পায়।

উপন্যাসের দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসূনকে ছাড়া শোভাবাজার ইউনিয়ন বার্ষিকের কাছে হেরে গেল, আবারও মাঠের বদলে দর্শকাসনে প্রসূন। ফুটবলের মাঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ঘোরের মতো তাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে। সঙ্গে স্মৃতিচারণায় ফিরে ফিরে আসে বাবার প্রতি হওয়া ফুটবল মাঠের অন্যায়ে প্রতিবাদস্পৃহা। তেমনই পাড়ার এক ছেলে প্রসূনের বাবাকে ঘুষখোর তকমা দেওয়ায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রসূন তার প্রতি শারীরিক আঘাত হানে। ফলে প্রকৃত ছেলেটির বাড়ির লোক প্রসূনের বাড়ি এসে প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্যকে আবারও অপমান করেন। বোঝা যায়, তিনি যুগের যাত্রীরই সদস্য। সেদিন সেই গোলের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য প্রসূনের বাবাকে দায়ী করেন এবং আজও যুগের যাত্রীর শীল্ড না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ জানান। এসব দেখে প্রসূনের নম্র মাও নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না। প্রসূন ফিরলে তার মা তাকে সজোরে প্রহার করেন। প্রসূন তার বাবাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, সত্যি তার বাবা সেই অত বছর আগের খেলায় ঘুষ নিয়েছিলেন কিনা। প্রসূনের বাবা জানান—

“আমি তোমায় জানানোর কোন প্রয়োজন বোধ করছি না। যদি তোমার লজ্জা হয়, তাহলে পিতৃ-পরিচয় দিও না।”^{২০}

এরপর প্রসূনের বাবা ছেলেকে বারণ করেন, তাঁর সূত্র ধরে ছেলে যেন আর কারোর সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া না করে। কারণ, এভাবে নিজস্ব বিশ্বাস অপরের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয় না। পরেরদিন আবার প্রসূনের মাকে রান্নাঘরে একটা টাকা দিয়ে প্রসূন চলে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সামান্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা থেকে প্রসূন এখন প্রতিদিন সংসারে এক টাকা দেয় এবং বাকি দেড় টাকায় ক্যালরিয়ুক্ত কোনো খাবার কিনে খায়, ফুটবলের মাঠের জন্য নিজের শারীরিক প্রস্তুতির তাগিদে। এইদিন মা আক্ষেপ করেন প্রসূনের গায়ে তাঁর হাত তোলার ঘটনায়। এরপর এই মা-ই বাবার মতন বড় ফুটবলার হতে বলেন ছেলেকে। মায়ের বুকো মাথা রেখে প্রসূন খেলার মাঠে হরিণ, চিতা, চিলের মতন খেলার স্বপ্ন দেখে, মাকে জানায় সে নিজেও বড় ফুটবলার হতে চায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঘটনা কাহিনির স্রোতে এক বছর পার করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূন উচ্চতায় বাড়লেও ওজনে বাড়েনি। অভাবের সংসারে লক-আউট হয়ে যাওয়া কারখানার দুর্শ্চিন্তায় একদিনের ফুটবলার অনিল ভট্টাচার্য অর্থাৎ প্রসূনের বাবাও শীর্ণকায় হয়ে পড়েন। খেলার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। শক্তি আসে আহরণত পুষ্টি থেকে। যে সংসারে প্রোটিন তো দূরের কথা রুটি জোটে অতিকষ্টে, সেখানে প্রসূনের লড়াইটা বহুবিধ।

“আমাদের রাতের রুটির বরাদ্দ একই রয়েছে, আমিষ খাদ্য বোধহয় বছরখানেক রান্না করার সুযোগ মা পায়নি, দোতলায় বাড়িওয়ালার রান্নাঘর থেকে যেদিন মাংস করার গন্ধ আসে, পিন্টু আর পুতুল সেদিন প্রাণপণে পড়ার মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করে।”^{২১}

অর্থাৎ পড়ার মধ্যে ডুবে থেকে ক্ষুধার সংযম ছোটবয়স থেকেই প্রসূনের ভাই-বোনদের রুচ বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রসূন এখন দিনে সাড়ে তিন টাকা পায়, রাতে পেট্রল পাম্পে কাজের বিনিময়ে। এমনই একদিন রাতে প্রসূনের সামনে মোটর গাড়িতে তেল ভরতে কাকতালীয়ভাবে আসে বিপিন, আনোয়ার, নিমাই। প্রসূন জানতে পারে, বি-সি রায় ট্রফি খেলার জন্য জুনিয়র বেঙ্গল টিমের হয়ে তার এককালের দুই প্রাণের বন্ধু দিল্লি যাচ্ছে বিমানে। বিপিন প্রসূনকে আবারও আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দলে ফেরার কথা বলে। রক্ত-মাংসের মানুষের ক্ষেত্রে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে আক্ষেপ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রসূনের ক্ষেত্রেও তা অন্যথা হয়নি। প্রসূনের স্বগতোক্তি বিশেষ নজর কাড়ে, যা তার এক আত্মসমীক্ষাও বটে।

“নিজের উপর রাগ হল, বোধহয় বোকামিই করেছি, ক্ষতি করলাম নিজেরই। মূহ্যমান হয়ে খাটিয়ার উপর বসে যখন এই সব ভাবছি, তখন ফিসফিস করে বুকোর মধ্যে কে কথা বলে উঠল : ‘কী ক্ষতি

করেছ, প্রসূন? পূরণ করে নেবার সময় অনেক পাবে। যাও যাও প্র্যাকটিসে নামো। খাটো, আরো খাটো। কিছু বোকামি করোনি, মনে রেখো, কদর পাবে একমাত্র খেলা দিয়েই, বেঙ্গল বা ইনডিয়ান ছাপ দিয়ে নয়।”^{২২}

এই যে আত্মসমীক্ষা ও নিজেকে অনুপ্রাণিত করা— একদিন হর্ষদা বা নীলিমা এই উপলব্ধির স্তরেই পৌঁছে দিতে চেয়েছিল প্রসূনকে। এই পরিচ্ছেদের শেষে ভি-আই-পি রোডে প্রসূনের মাথার উপর দিয়ে নিচু হয়ে পশ্চিমে চলে যাওয়া বিমানটিতে নিমাই, আনোয়ার সওয়ার। তবে, প্রসূনের স্বপ্ন উড়ান শুরু হয়ে যায় না, নতুন উদ্যমে নতুন দিনের আশা আর জেদ তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রসূন এসে পৌঁছয় সোনালী সঙ্ঘে। এতদিন নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটবলের যে কৌশল রপ্ত করতে চেয়েছিল সে, সোনালী সঙ্ঘে দাসু গুহ এবং কমল পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে তা সে খুঁজে পায়। প্রসূন তার সক্ষমতা প্রমাণ করে দৌড় আর গোল করার কৌশল দেখিয়ে। দাসু গুহর প্রসূনের প্রতিভা চিনে নিতে একটুও কালবিলম্ব হয় না। পেট্রল পাম্পের চাকরি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দিয়ে দাসু গুহ প্রসূনকে দলে রেখে দিতে চান। প্রসূনও সম্মত হয়, তবে বংশে কেউ কখনও ফুটবল খেলেছে কিনা দাসুদা জানতে চাইলে প্রসূনের উত্তর ছিল ‘না’। আসলে সে পুনরায় বাবার অপমান চায়নি। মানুষের ভ্রান্ত ধারণা কথায় নয়; খেলার মাঠেই খেলা দিয়েই জবাব দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে আই-এফ-এ অফিসে প্রসূন সই করতে গেলে সেখানে বিপিনের সঙ্গে তার দেখা। তখনও বিপিন শোভাবাজার ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রসূনকে। কিন্তু যেখানে ফুটবলের কৌশল শিখতে চেয়েও শিখতে পারেনি প্রসূন, সেখানে পুনরায় ফিরতে চায় না সে। নিমাই আর আনোয়ারের সঙ্গে দেখা হলে, আগের মতো আর সহজ সম্পর্ক প্রকাশ পায় না কোনো পক্ষ থেকেই। বাড়ি ফিরে প্রসূন তার মায়ের হাতে পাঁচটি একশ টাকার নোট দেখতে পায়, সঙ্গে একটি চিঠি—

“প্রসূন, কাল ঠিক দুটোর সময় আমি অপেক্ষা করব আই-এফ-এ অফিসের কাছে, যেখানে তোর সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছিল। ইতি, বিপিনদা।”^{২৩}

প্রসূন মুহূর্তে বুঝে যায় বিপিন ঘুষ দিয়ে প্রসূনকে নিয়ে যেতে চায়। সেই রাতেই সে বিপিনের বাড়ি গিয়ে সেই টাকা ফেরত দিয়ে মোক্ষম জবাব দিয়ে আসে—

“কয়েক ঘন্টার জন্য টাকাটা আমার কাছে থেকে গেছিল। সেজন্য সুদ আপনার প্রাপ্য। শোভাবাজারের সঙ্গে যেদিন খেলা থাকবে, সেদিন সেটা শোধ দেবো।”^{২৪}

বলা বাহুল্য, অভাব-অনটনের সংসারে হঠাৎ পাওয়া পাঁচশ টাকার মূল্য অনেক। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে খেলা আর স্বপ্নের আদর্শকে বিসর্জন দিতে শেখেনি প্রসূন; সে এগিয়ে যেতে চায় সঠিক পথে।

ষোড়শ অধ্যায়ে প্রসূনের সেই চ্যালেঞ্জ, যে শোভাবাজার ইউনিয়ন থেকে সে বেরিয়ে এসে সোনালী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে, দুই দল মুখামুখি। যে ফুটবলারদের সঙ্গে সে একদিন খেলেছে, আজ তারা তার প্রতিপক্ষ, প্রসূন আত্মপ্রত্যয়ী। তবে, মাঠের রাজনীতির শিকার হতে হয় তাকে। সেই টিকাদার প্রসূনকে গোল করার মুহূর্তে ডান পাঁজরে সজোরে লাথি দেয়। যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়েও পুনরায় জোর করে মাঠে নামে প্রসূন। একসময় টিকাদারের তলপেটে লাথি মারে আনোয়ার। এই আনোয়ার যে প্রতিপক্ষ দলে থাকা সত্ত্বেও বন্ধুর প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ মাঠেই নিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে আনোয়ার জুনিয়র ইনডিয়া টিমে সুযোগ পেয়েছে, একটি সহযোগীকে আঘাত করার অপরাধে তার সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবেও বন্ধুত্বের দাম দিতে পিছপা হয়নি সে। প্রসূনের ভাই পিন্টু প্রথমবার মাঠে দাদার খেলা দেখতে গিয়েছিল। মাকে এসে দাদার আঘাত পাওয়ার কথা জানায়। বহুবছর আগে ফুটবল মাঠে স্বামীর পরিণতির কথা স্মরণ করে, আশঙ্কা এনে তিনি বলেন শুধু—

“ফুটবলই আমার সর্বনাশ করবে।”^{২৫}

সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে প্রসূনের আঘাত গোপনের প্রচেষ্টা। আসলে চোখে যে স্বপ্ন নিয়ে সে দৌড়ে চলেছে, এই আঘাতই যদি সেই স্বপ্ন পূরণে আঘাত হানে, সেই আশঙ্কা তার। তাই দাসুদার কাছে খবর দেয় সে, মাসির বিয়েতে সে

মামাবাড়ি গেছে। এরই মধ্যে তিন হরিহর আত্মার দুইজন এসে নিঃশব্দে বন্ধুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, নিমাই আর আনোয়ার। দলের চেয়েও যদি বন্ধুত্ব বড় না হত তাহলে ট্যাক্সিতে তুলে শ্যামবাজারে এনে প্রসূনের চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করত না। প্রসূনের পাঁজরের হাড় না ভাঙলেও ব্যানডেজ করে দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন। অগত্যা বাড়িতে শুয়ে পাঁচটা ম্যাচ খেলার সুযোগ হাতছাড়া হল প্রসূনের। এরপর সাহস করে আবারও মাঠে নামে প্রসূন। স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে, বি-এন আর-এর সঙ্গে খেলায় দৃষ্টান্ত রেখে গোল করে প্রসূন। সোনালী সজ্জকেও এগিয়ে নিয়ে যায় অনেকটা। পাশাপাশি প্রসূন ফুটবলের মাঠে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার পথেও বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়। জানতে পারে, পরবর্তী ম্যাচ যুগের যাত্রীর সঙ্গে। এই সেই 'যুগের যাত্রী', প্রসূনের বাবার ফুটবলার পরিচয়ে কলঙ্ক দিয়েছিল সেই দল। তবে, প্রসূনের আত্মপ্রত্যয় এখন অনেক বেশি আগের তুলনায়। লীগের টপ স্কোরার এখনও পর্যন্ত প্রসূন। সে পাঁচটা ম্যাচে এগারটা গোল করেছে। তাই নানান দল পরবর্তী বছরে প্রসূনকে নেওয়ার পরিকল্পনাও করছে।

মাতৃহারা নীলিমা সংসারের বহু দায়িত্ব পালন করে, তারপর পড়াশুনা করে স্কুল ফাইনালে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করে। এই খবর দিয়ে শুরু অষ্টাদশ অধ্যায়ের। প্রসূন নীলিমার থেকে মাস ছয়েকের বেশি বড় কিনা, এসব ভাবতে গিয়ে আর জিজ্ঞাসা করার মাঝে প্রসূনকে সে প্রণাম করে ফেলে। তার আগে প্রসূনের মা নীলিমার পাশ করার কারণে কিছু উপহার দেবে ভেবেও অর্থের অভাবে সেই ইচ্ছা তখনকার মতো বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এরপর আছে বছর চল্লিশের কটা চোখের ভদ্রলোকের কথা। সেই যুগের যাত্রীর পক্ষ থেকে তিনি এসেছেন, প্রসূন যেন তাদের বিরুদ্ধে না খেলে, সেইজন্য একশ টাকা ঘুষ দিতে চান। বোঝাই যায়, ফুটবলার প্রসূন এখন নিজগুণে প্রতিপক্ষের ত্রাস। কিন্তু এতটাই তো সে চেয়েছিল, কৌশল শিখে অনুশীলন করে নিজের নাম ফুটবলের দুনিয়ায় খোদাই করে রাখতে। তবে, ঘুষ দিয়ে তাকে রোখা সম্ভব নয়। এর আগেও বিপিনের পাঠানো অতগুলো টাকা ঘুষ অবলীলায় ফিরিয়ে দিয়েছে। সংসারে যতই আর্থিক অনটন থাকুক, ঘুষের টাকা সে গ্রহণ করবে না, অর্থ উপার্জন করবে পরিশ্রমের বিনিময়ে। প্রসূনের বাবা কোনো সিদ্ধান্ত দেন না, প্রসূনকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। প্রসূন সেই কটা চোখের লোকটিকে দাঁতে দাঁতে চেপে জানায়, যাত্রীকে সে পরাজিত করবেই। এরপর 'গেট আউট' বলার পর লোকটি হুমকি দিয়ে যায়, প্রসূন গোল দিতে পারলেও দলের গোল খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। মনে করিয়ে দেন, ফুটবল একজনের নয় এগারজনের খেলা। তবে, প্রসূন নিজের আয়নার কাছে স্পষ্ট। এখন সে দ্বিধাহীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছে।

উনবিংশ অধ্যায়ে এসে যুগের যাত্রীর মুখোমুখি সোনালী সজ্জ। তবে কটা চোখের লোকটি প্রসূনকে যে হুমকি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফুটবল একজনের নয়, এগারজনের খেলা, তা টের পায় প্রসূন মাঠে। যুগের যাত্রীর গোছানো ডিফেন্স। ওদের খেলোয়াড়দের কৌশলের কাছে প্রসূন একা একটা সময় পেরে ওঠে না। কারণ, গোলকিপার রবির খেলা দেখে এবং সোনালীর অন্য অনেকের ক্রটিপূর্ণ খেলার ধরণ দেখে মাঠেই প্রসূনের সন্দেহ হয়। সন্দেহটা সেই কটা চোখের লোকটিকে ঘিরে। যে টাকা দিয়ে প্রসূনকে যুগের যাত্রী থামিয়ে দিতে পারেনি, সেই টাকা দিয়ে অন্যদের মনে হয় হাত করেছে। তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সবার সাপোর্টার যেহেতু যুগের যাত্রীকে হারাতে চায়, তাই প্রসূনের দৃষ্টান্তমূলক গোলে তার সমর্থনে গ্যালারিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তবে, ২-৩ গোলে প্রসূনের দল সোনালী সজ্জ পরাজিত হয় যুগের যাত্রীর কাছে। বাবার সামনে প্রসূন কথা দিয়েছিল যুগের যাত্রীকে হারাবে। কিন্তু সেকথা রাখতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ল প্রসূন। শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও শরীর জুড়ে নেমে আসে তার মানসিক ক্লান্তি।

উপন্যাসের বিংশ অধ্যায় প্রসূনের জীবনে মোড় ঘোরানো অধ্যায় শুরু করল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী অর্থাৎ তৎকালীন তিনটি বড় দলই প্রসূনকে দলে নিতে চায়। এটাই তো প্রসূন চেয়েছিল। খেলার দক্ষতা দেখিয়ে এমন একটা জায়গা করে নিতেই চেয়েছিল সে। তবে যুগের যাত্রী ছয় হাজার টাকা দিতে চায়। কটা চোখের লোকটি স্পষ্ট জানান, এটি ঘুষ নয়; পারিশ্রমিক। প্রসূনও স্পষ্ট বলে, সে পরিশ্রম করে উপার্জন করতেই চায়। এছাড়াও যুগের যাত্রীর বর্তমান সম্পাদক অনাদি বিশ্বাস প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে হওয়া দলের অন্যান্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। একথা শুনে আশ্বস্ত হয় প্রসূন। সবাই যে তার বাবাকে অবিশ্বাস করেন না, তা জেনেও নিশ্চিত হয় সে। প্রসূনের দুই বন্ধু নিমাই এবং আনোয়ারও যোগ দেয় যুগের যাত্রীতে। পূর্ববর্তী সোনালী সজ্জের দাসুদাও প্রসূনকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যুগের যাত্রীর

মতো বড় দলেই যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে, যুগের যাত্রী প্রসূনকে দলে নিয়েও খেলায় নামায়নি পরপর ম্যাচে। প্রসূন অর্ধৈর্ষ হয়ে ওঠে, না খেললে খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। কটা চোখের লোকটি ওরফে সকলের ডাকুদা যখন বলেন—

“যাত্রীর মতন ক্লাব তোমার মতন দু-চারটে প্লেয়ারকে বসিয়ে টাকা দিলে দেউলে হয়ে যাবে না, টাকার জন্যই তো খেলা, তা যখন পাছ তখন এত উতলা হওয়া কেন?”^{২৬}

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে প্রসূনের মনে হল, বাড়িতে দুই হাজার টাকা নিয়ে পৌঁছানোর পর কেমন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছিল। বাড়িতে পরোটা আর মাংস হয়েছিল। ভাই-বোনেরা কতদিন মাংস খায়নি। এতদিন রুটির বরাদ্দটুকু নিয়েই সংসার চলেছে, ছয় হাজার টাকার কথা শুনে প্রসূনের বাবা অবাক হয়ে তার মাকে বলেছিলেন, সাত বছর খেলেও তিনি এত টাকা অর্জন করতে পারেননি।

উপন্যাসে একুশ সংখ্যাচিহ্নিত অধ্যায়ে প্রসূনের কেরিয়ারের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে শুরু করে। আসলে মন কর্মের নিয়ন্ত্রক অনেকাংশেই। মানসিক ক্ষয় কর্মে ব্যাঘাত ঘটায়; স্পর্শকাতর ব্যক্তিজীবনে একথা সত্য। ‘থ্রি মাসকেটিয়ারস্’ প্রসূন-নিমাই-আনোয়ার—তিনজনের সম্পর্ক আর আগের মতো সহজ নয়। যুগের যাত্রী দলে যদিও এখন তারা আবারও একসঙ্গে খেলার জন্য যোগ দিয়েছে। কিন্তু যুগের যাত্রীতে প্রসূনকে পরপর ম্যাচে বসিয়ে রাখায় প্রসূন অনুশীলনচ্যুত হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। এরই মধ্যে সেই মানসিক বিপর্যস্ততা আরও বাড়িয়ে তুলল বাবার ইতিহাস। যাত্রীর কখনও লীগ বা শিল্ড না পাওয়ার কথাসূত্রে অনিল ভট্টাচার্যের গোল মিসের কথা সরাসরি না বলেও সবাই প্রসূনের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকায়—

“আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন তারা অদ্ভুত একটা জন্তু দেখছে। কারুর ঠোঁট বাঁকা, কেউ কেউ চোখে চোখে হাসল, আমি মাথা নিচু করে ঘেমে উঠলাম। মনে হল, ডাকুদা ইচ্ছে করে আমাকে এই অবস্থায় ফেলেছে। যেন কিছু একটার প্রতিশোধ নিচ্ছে।”^{২৭}

এরপর হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে খেলায় শেষ দশ মিনিটে মাঠে নামে প্রসূন। কিন্তু যে প্রসূন অনায়াসে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খেলত এবং গোল দিত, সেই প্রসূন নিমাই এর পাঠানো বলে গোল করতে পারল না। উপরন্তু গ্যালারির দর্শক ও অন্যান্য ফুটবলারের হাসির পাত্র হয়ে উঠল। সবমিলিয়ে প্রসূন অবসাদে জর্জরিত হতে থাকে। অনুশীলন করতে আর যুগের যাত্রীতে যায় না। এমন একদিন প্রসূনের কাছে আসে নিমাই আর আনোয়ার। বন্ধুকে সর্বোতভাবে পুনরায় মাঠে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে। একসময় ‘গড়ের মাঠ’, ‘শীল্ড’, ‘ফুটবল’—এই শব্দগুলো প্রসূনের মনে শিহরণ জাগিয়েও বিগতদিনের অভিজ্ঞতায় ভয় ঘিরে ধরে তাকে। কিন্তু আনোয়ার প্রসূনকে বলে—

“কীসের ভয়? পাবলিককে? গোল দে, দেখবি, আবার ওরাই তোকে মাথায় তুলে নাচবে।”^{২৮}

অনেক ভেবে প্রসূন এরপর পুরনায় যাত্রীর মাঠে অনুশীলন করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে প্রসূন আবারও মাঠে পুরানো ভূমিকায়। যাত্রী শীল্ড ফাইনালে উঠতে প্রসূন টের পায় তার কত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আছে। কারণ টিকিটের জন্য তারা অস্থির করে তোলে প্রসূনকে। এতদিন বিপর্যয়ের সময় এনাদের কোন অস্তিত্ব অনুভব করেনি প্রসূন। জগতে এমনটাই হয়। বিখ্যাত হয়ে ওঠার বন্ধুর পথে যত না মানুষজনের সঙ্গ পাওয়া যায়, খ্যাতি অর্জনের সময় তারা ঘিরে থাকেন। আবারও পরপর রাউণ্ডে প্রসূনের গোল। আবারও সে ফিরে পেয়েছে আত্মপ্রত্যয়। সেমি-ফাইনাল খেলার আগের দিন ক্লাব প্রেসিডেন্টের পার্কসার্কাসের বাড়িতে ফুটবলারদের রাখা হয়। সেখানে খবর আসে আনোয়ার নাকি টাকা খেয়েছে। মহামেডানের সঙ্গে খেলার কারণে এ জাতীয় কথা সবাই বিশ্বাস করবে। ধর্মগত রাজনীতিকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল সেই শোভাবাজার ইউনিয়নের টিকাদার। একথা বুঝতে প্রসূনের অসুবিধা হয় না। ডাকুদা আনোয়ারকে না খেলাতে চাইলে, প্রসূন-নিমাই-শ্যাম-আব্রাহাম সবাই জোর গলায় আনোয়ারকে খেলাতে অনুরোধ করে। শেষ পর্যন্ত আনোয়ার খেলে, প্রসূন গোল দেয়। সেমি ফাইনালে জয়ী হয় যুগের যাত্রী।

উপন্যাসের তেইশতম পরিচ্ছেদে সেই কাঙ্ক্ষিত শীল্ড ফাইনালের আগে প্রসূনের মায়ের আশ্বাস আর মায়ের কোলে শান্তির ঘুম এবং ইডেনের ফাইনাল। ষাট-সত্তর হাজারের বেশি দর্শকের সামনে প্রসূন তার বাবার সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের

উত্তর দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে, খেলায় অনুশীলন সত্ত্বেও তাত্ক্ষণিকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসূন গোলের সুযোগ হাতছাড়া করলে ইডেনে আর্তনাদ শোনা যায়।

“ইডেনের আর্তনাদ তখন আছড়ে পড়ছে গ্যালারী থেকে, আমি মাথা নামিয়ে ফিরে যাচ্ছি, তখন প্যাভিলিয়নের সামনের গ্যালারি থেকে কে চোঁচিয়ে উঠল, “কার ব্যাটা দেখতে হবে তো! আমি মুখ তুলে একবার তাকালাম।”^{২৬}

আবারও যুগের যাত্রীর ফাইনালের ইতিহাস, প্রসূনের বাবার কলঙ্ক। প্রসূন এই কলঙ্ক মুছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন উদ্যমে খেলতে থাকে। এরপর আনোয়ারের দেওয়া বল প্রতিপক্ষ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গোল দেয় প্রসূন। গোল দেওয়ার পর নিজেকেই অবিশ্বাস্য লাগে প্রসূনের। বিস্ময়ের ঘোরে অভিভূত হয়ে যায় প্রসূন নিজেই। এখানে খেলার অর্ধ-সময়ের বাঁশি বাজার মধ্যে দিয়ে পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ চব্বিশতম পরিচ্ছেদ। ফাইনাল খেলার পরবর্তী অর্ধ সময়; যুগের যাত্রী ও সমর্থকদের গোলের জন্য অপেক্ষা। তখনও প্রসূনের উপর প্রবল মানসিক চাপ। গলা শুনে প্রসূন বুঝে যায়, ডাকুদা। যিনি আবারও পুরানো ইতিহাস খুঁড়ে বলছেন, এমন গোল একজন মিস করেছিলেন। কিন্তু প্রসূন আগের মত থমকে যায় না। বাবার অপমানের জবাব দিতে সে প্রস্তুত। কুড়ি বছর আগে অনিল ভট্টাচার্য, কুড়ি বছর পরে প্রসূন ভট্টাচার্য—যুগের যাত্রীর ফাইনালে ওঠা এবং পিতা-পুত্রের খেলার নজির খবর হয়ে ভেসে আসে প্রসূনের কানে। প্রসূন জানে না তার বাবা; যিনি ফুটবলের উপর অভিমান করে আছেন কতগুলো বছর, তিনি আসবেন কিনা ছেলের খেলা দেখতে! রেঙ্গুন ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে যুগের যাত্রীর ফাইনালে টানটান উত্তেজনা। খেলার শেষ পর্যায়ে এসে যখন গোল হচ্ছে না, তখন গ্যালারিতে দর্শকরাও অধৈর্য। নিমাই-বিষ্ণু-আব্রাহাম হয়ে প্রসূনের কাছে বল। ছোট মাঠে নিজস্ব পরিচালনায় দীর্ঘদিন যাবৎ ভাই পিন্টুকে নিয়ে অনুশীলনের পরীক্ষার মহামুহূর্ত।

“মোটর বাইকের হঠাৎ স্পীড তোলার মতো আমি প্রচণ্ড দমকে, ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে ঢুকলাম। দেরি হয়ে গেছে। চার পা এগোন মাত্র বুঝে গেলাম বলটাকে হাফ ভলিতে নিলে বারের উপর দিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কে বলে উঠল, ‘স্ট্রাইকার, এবার ঘা মারো, সর্বশক্তি দিয়ে মারো।’ শেষ চেষ্টায় চার গজ দূর থেকে ঝাঁপ দিলাম। বল থেকে চোখ সরাইনি। কপালের ডানদিকে বলটা লাগছে, হাতুড়ির মতো মাথাটা দিয়ে আঘাত করলাম বলে আর মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়লাম।”^{২৭}

যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে ফুটবলের রাজ্যে পদার্পণ করেছিল প্রসূন, আজ সেই স্বপ্নের সাক্ষী সে নিজেই।

“আমি মুখ তুলে দেখছি অদ্ভুত একটা দৃশ্য, রেঙ্গুন ইউনাইটেডের গোলকিপার গোলের মধ্য থেকে কুড়িয়ে নিল শাদা-কালো ফুটকি আঁকা আমার পৃথিবীটাকে। এরপর ধীরে ধীরে একটা গর্জন আমাকে কাঁপিয়ে দেহের উপর দিয়ে বহে যেতে শুরু করল।”^{২৮}

এই ‘গর্জন’ ইডেনে যুগের যাত্রীর সমর্থকদের গর্জন; জয়ের উল্লাস। এরপরই টেনেটের বাইরে এসে প্রসূনের নীলিমা আর পিন্টুর সঙ্গে দেখা। প্রসূনের মা সারাদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আছেন খেলার জন্য প্রার্থনায়। আলোর উৎসবে মাতোয়ারা যুগের যাত্রীর কুড়ি বছর আগের ফুটবলার অনিল ভট্টাচার্য অর্থাৎ প্রসূনের বাবাও এসেছিলেন ছেলের খেলার সাক্ষী হতে।

“দেখতে পেলাম অনেক লোকের মধ্যে, একজনের কপালে চিকচিক করছে একটা টিপ। অত্যন্ত উজ্জ্বল মর্যাদাবান।”^{২৯}

প্রসূনের বাবার সেই আঘাতের চিহ্ন কুড়ি বছর পর ছেলের হাত ধরে প্রত্যাঘাতের মুহূর্ত ফিরিয়ে দিল। সেই প্রত্যাঘাত দলের প্রতি, সেইসব মানুষের প্রতি, যারা ভুল বুঝে তাঁকে কালিমালিঙ্গ করেছিল। প্রসূন যথার্থ ছেলের দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিন সংসারের হাল ধরতে না পারার জন্য যা আক্ষেপ জমেছিল, প্রসূনের বুকে, আজ সে খেলা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করে ‘ফুটবলার প্রসূন’ হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। এমনটাই তো চেয়েছিল সে। আনন্দে আত্মহারা জনগণ প্রসূনের নাম ধরে ছুটে আসার দৃশ্যে অর্থাৎ আগামীর তারকা ফুটবলারের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

তিন

মতি নন্দীর ‘স্ট্রাইকার’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসূন এক কিশোর চরিত্র। যে বয়সে জীবন অনেকক্ষেে সহজস্রোতে ভাসে আর পাঁচজনের, সেখানে জীবনের অনেক রুঢ়তার মুখোমুখি হয়েছে সে। পরিবার-সমাজ-লোকগুঞ্জন তাকে বয়সের তুলনায় আরও একটু বড় করে তুলেছে। ‘প্রসূন’ শব্দের অর্থের সার্থকতায় তার জীবনেও কুঁড়ি থেকে ফুল বা ফলে রূপান্তর ঘটেছে নানান ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে মোকাবিলা করে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাবার জিন তার ফুটবলস্পৃহা তৈরি করে ও বাবার প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তার খেলোয়াড়সুলভ জেদ তৈরি করে। প্রথাগত শিক্ষা মানুষের প্রাথমিক ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু শিক্ষা কেবল পুঁথিগত ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, খেলার মাঠ ও প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মুহূর্ত জীবনে শিক্ষাদান করে। তাই স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা প্রসূনের কাছে ফুটবল ও ফুটবলময় জীবনই পাঠদানের পাঠশালা। স্বপ্ন সবারই থাকে। কিন্তু স্বপ্ন ছুঁতে পারেনা সবাই। স্বপ্ন ছুঁতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। শুধুমাত্র ভাগ্যের হাতেই সুতো থাকেনা, নিজের হাতেই থাকে বেশি। এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিল প্রসূন। তাই সে লড়াই করেছে স্বপ্ন স্পর্শ করার জেদে। অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে পেয়েছে সফলতা। মতি নন্দী নিজে ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক। যথার্থই তিনি অনুধাবন করেছেন ফুটবলার জীবনের ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়া। খ্যাতনামা ফুটবলার ‘হয়ে ওঠা’র পথ কেমন হতে পারে, সেই নেপথ্য কাহিনিই প্রসূন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাস্তবতা পেল উপন্যাসে।

পারমিতা রায়কে দেওয়া ‘সোজা ব্যাটে মতি নন্দী’ বিষয়ক এক সাক্ষাৎকারে মতি নন্দী প্রসূন এবং তার বাবার প্রসঙ্গে যা বলেছেন এবং প্রসূন চরিত্রটি নির্মাণে বাস্তবের ছায়াপাত ঘটেছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন, সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

“প্রশ্ন : আপনার ধরনের উপন্যাসে কিংবা গল্পে বাবা আর ছেলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা শেষ পর্যন্ত একটা আশ্চর্যসুন্দর হয়ে ওঠে, অভিমান আর থাকে না তাই না?”

মতি নন্দী : আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত পরিবারগতপ্রাণ। পারিবারিক দুর্দশা কতটা শেয়ার করে বলো তো ছেলেমেয়েরা। সেই ‘আবছা মুখগুলি’র অসীম বাবাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পায়ে চোট নিয়েও শেষ পর্যন্ত খেলতে বেরিয়ে যায়। এই ছেলেটি কতটা responsible। প্রসূন তার বাবার হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেয়। ...নিজেদের বঞ্চিত করে উপার্জনের টাকা এরা সংসারে দিয়ে দেয়। অথচ এদের পুষ্টির জন্য ভালো খাদ্যের প্রয়োজন।

প্রশ্ন : প্রসূন কি কলকাতার ময়দানের কোনো চরিত্রের ছায়া অবলম্বনে?

মতি নন্দী : না, না। কেউ না, কাউকে দেখিনি, তবে অনেকেই আমাকে বলেছেন।”^{১০}

প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্যের আপাত গাঙ্গীর্ষ বা ছেলের সঙ্গে ফুটবলকেন্দ্রিক দূরত্বস্থাপন তাঁর জীবনের কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। উপন্যাসের আবর্তনে শেষ দিনে এসে বোঝা যায়, নিজের জীবনের আশঙ্কার জন্য ছেলেকে ফুটবলের দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তরের সত্যিটা তিনি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রসূন। প্রসূনের রঙে ফুটবল, প্রসূনের মজ্জায় ফুটবল। সহজাত সত্তা, প্রবৃত্তিকে কেড়ে নেওয়া যায় না। অথচ, নিজের বিগত দিনের কথা ভেবে অনিলবাবু স্বতঃস্ফূর্ততাও পাননি। তাই প্রকাশ্যে ছেলেকে ফুটবল খেলায় সমর্থন না করতে পারলেও প্রচ্ছন্ন মানসিক সমর্থন তাঁর অবশ্যই ছিল। লক্ আউটের পর পুনরায় পরিশ্রম করে অন্য কাজ করেন। তিন ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার প্রতিপালনে নিষ্ঠাবান তিনি। অভাব দূর করতে সম্পূর্ণ না পারলেও অনিলবাবুর সাংসারিক দায়বদ্ধতা যথেষ্ট। যুগের যাত্রী তাঁর সঙ্গে ফুটবলের মাঠে যে অন্যায় করেছিল, সেই ক্ষত তিনি নিজের মধ্যে বহন করতেন বছরের পর বছর। মিথ্যে অপবাদে জর্জরিত মানুষটি ছেলের কাছেও যন্ত্রণা প্রকাশ করেননি। কিন্তু পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে একসময় সত্য উদঘাটিত হয়। তাই ছেলের হাত ধরে সময়ের অপেক্ষায় অনিলবাবুর সেই খেলার মাঠের কালিমা মুছে সত্য সবার সামনে স্পষ্ট হয়। ছেলের খেলার সাক্ষী হতে আসা অনিল ভট্টাচার্যের সেই আপাত গাঙ্গীর্ষ সেদিন সরে গিয়ে প্রকাশ পায় ফুটবলার ছেলের প্রতি অপত্য ম্লেহ। একই যুগের যাত্রীকে জিতিয়ে তার ছেলে বাবার

প্রতি হওয়া অন্যায়ের জবাব দিয়েছে। খেলার মাঠের রাজনীতি অনিল ভট্টাচার্যের প্রাণচাঞ্চল্য একদিন কেড়ে নিয়েছিল। সেই খেলার মাঠেই তিনি পেলেন অপেক্ষার ইতিবাচক প্রতিদান।

প্রসূনের ‘মা’ চরিত্রটির কোনো নাম উল্লেখ করেননি ঔপন্যাসিক। কথায় আছে, নারীরা প্রথম জীবনে বাবার, পরবর্তী জীবনে স্বামীর ও শেষজীবনে সন্তানের পরিচয়ে পরিচিতা। বিশ শতকের শেষার্ধ্বে এসে একথা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও এই নাম না দেওয়ার বিষয়টি প্রশ্ন জাগায়। তবে, উপন্যাসের শর্তপূরণে এক্ষেত্রে চরিত্রটি একদিকে প্রাক্তন ফুটবলারের স্ত্রী এবং অন্যদিকে বর্তমান ফুটবলারের মা—এই পরিচয়টির দিকেই আলোকপাত করা হয়েছে। এই নারীচরিত্রটির অসীম ধৈর্য, শান্ত, নম্র ব্যবহার নিপাট নিরীহ নারীর প্রতিফলন। ফুটবল স্বামীর জীবনে সর্বনাশ এনেছিল ভেবে মাঝেমাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেও শেষ পর্যন্ত প্রসূন অর্থাৎ ছেলেকে মানসিকভাবে সমর্থন করে গেছেন। নিজে অভুক্ত থেকে কখনও ছেলের জন্য রুটি রেখেছেন, যাতে খিদে নিয়ে খেলার মাঠে না খেলতে হয় ছেলেকে। বাবার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধে যুগের যাত্রীর হয়ে অংশ নেওয়া ছেলের খেলার দিন মাঠে না এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রার্থনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পরিমিত আয়ে লক্ষ্মীমন্ত এই নারী দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামী নিয়ে গুছিয়ে সংসার করার আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। স্নেহশীলতার ছায়া ঘেরা প্রসূনের মা শুধুমাত্র নিজের সন্তানকেই নয়, প্রতিবেশী মাতৃহারা নীলিমাকেও আপন সন্তানজ্ঞানে আপন করে নিয়েছিলেন। আর্থিক সামর্থ না থাকলেও পরীক্ষায় ভালো ফল করার পর নীলিমাকে শাড়ি দিতে চেয়েছেন প্রসূনের মা। যথার্থ মাতৃময়ী রূপ ধরা পড়েছে উপন্যাসে প্রসূনের মায়ের চরিত্রে।

নিমাই এবং আনোয়ার প্রসূনের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রসূন-নিমাই-আনোয়ারকে ঔপন্যাসিক ত্রি-মাসকেটিয়ারস বলে উল্লেখ করেছেন। একসময়ের বন্ধুত্ব সময়ের স্রোতে কিছুটা বিনষ্ট হয় ঠিকই। তবে, তা প্রত্যেকের পরিস্থিতি ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে। তিনজনই ছিল ফুটবলার। তবে, আদর্শ ও অভীষ্ট সবসময় বন্ধুত্বেও সমান হয় না। তাই তাদের মধ্যে উপন্যাসের মধ্যবর্তী অংশে দূরত্ব তৈরি হয়। তবে, প্রকৃত বন্ধুত্ব সেটাই, সেখানে সময়ের স্রোত পুনরায় শিথিল বন্ধন অনায়াসে জুড়ে দিতে পারে। ঠিক তেমনই আবারও খেলার মাঠে তাদের দীর্ঘ দূরত্ব মুছে তারা এক হয়ে যায়। একেই বলে অমলিন বন্ধুত্ব।

অন্যদিকে উপন্যাসের আবর্তনে শুরু থেকে শেষ অবধি এক কিশোরী চরিত্র প্রসূনের ফুটবলার হিসাবে খ্যাতি অর্জনের বড় কাভারী। সে নীলিমা। প্রত্যক্ষ প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ না পেলেও, প্রসূন ও নীলিমার পারস্পরিক ভালোলাগা, নির্ভরশীলতা, মান্যতা, নির্মল এক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। নুটু নামক প্রতিবেশীর মেয়ে মাতৃহারা নীলিমা সংসারের হাল খুব অল্প বয়সে ধরায় তার মধ্যে আছে পরিণতবোধ। প্রসূন যখন খেলাবিষয়ক নানান সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্ত, তখন নীলিমা তার সাধ্যমতো দূরদর্শিতা দেখিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রসূনকে সাহায্য করেছে। আকাশের স্বাধীন রঙ নীল, তা থেকে নীলিমা। আবার নীলিমা নামের অপর অর্থ সৌন্দর্য। বাচনভঙ্গিমায় স্পষ্টতা, স্বাবলম্বী হওয়ার দৃঢ়তা কিশোরী নীলিমাকে আকাশের মতো অনন্ত সুন্দর চরিত্র করে তুলেছে।

চার

ফুটবলের মাঠে ‘স্ট্রাইকার’ হল এমন খেলোয়াড়, যিনি ডিফেন্স এর বদলে বলে আঘাত করে গোল করেন। এক্ষেত্রে উপন্যাসের নামকরণ প্রসূনের ফুটবলার সত্তার পরিচায়ক। তবে শুধুমাত্র মূল চরিত্রের গুণকেন্দ্রিক নামকরণই নয়, ‘স্ট্রাইকার’ নামটির মধ্যে প্রসূনের জীবনের ব্যঞ্জনাও লুকিয়ে রয়েছে। বলে আঘাত দিয়ে গোল করার মতো, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বাবার লড়াই আর অপমানের প্রত্যুত্তর জনগণকে সে দেয় শেষ পর্যন্ত বলে আঘাত করে গোল করার মাধ্যমেই। প্রখ্যাত সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাস প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন—

“চারিদিকে সবাই যখন হতাশার কথা বলে, ‘অবক্ষয়’ যখন একটা ‘ক্লিশে’ হয়ে যৌনবিকার প্রদর্শনীর অবাধ্য অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে—তখন এইসব উপন্যাসে শ্রী নন্দী অবিরাম লড়াই ও জয়ের কথা বলেছেন। খেলার মাঠের অনুকরণেই এখানেও আমরা বলতে পারি জয়টাই বড় কথা নয়—লড়াইটাই আসল।”^{৩৪}

মতি নন্দীর 'স্ট্রাইকার' উপন্যাসের চব্বিশটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আছে প্রসূনের সেই লড়াইয়ের নানা প্রচেষ্টা, কৌশল, পদক্ষেপ ও শেষে সাফল্য।

'স্টপার' বা 'স্ট্রাইকারে'র মতো মতি নন্দীর ফুটবলকেন্দ্রিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবিন পালের মন্তব্য বিশেষ প্রাধিকানযোগ্য—

“গড়ের মাঠের পরিস্থিতি জানতে হলে সংবাদপত্রের পরিবর্তে মতি নন্দীর এসব বই পড়া অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন— বড় খেলোয়াড়ের ইনজুরির চিকিৎসা না হওয়া, চোট সত্ত্বেও জোর করে খেলানো, ফুটবলারদের টাকা ও চাকরি পাওয়া, বড় ক্লাবের খেলোয়াড়কে দলে নিয়ে না খেলিয়ে নষ্ট করা, খেলোয়াড়ের বাড়িতে এসে ঘুষ দেওয়া, দারিদ্র্যের কথা জেনে চাকরী বা টাকার টোপ ইত্যাদি। ফুটবল খেলার প্রসঙ্গকে জীবনবোধের প্রসঙ্গে ব্যবহারে লেখকের মুসিয়ানা অতুলনীয়।”^{৩৫}

উপন্যাসের আঙ্গিকে তাই 'স্ট্রাইকার' হয়ে উঠেছে সাহিত্য অতিক্রমী বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকের ফুটবল মাঠের তাৎপর্যপূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যচিত্রবিশেষ, এই তথ্যচিত্র লেখকের কলমের গুণে পাঠকচক্ষে শব্দ-বাক্য-চিত্রকল্পে নির্মিত।

Reference:

১. নন্দী, মতি, *স্ট্রাইকার*, প্রথম প্রকাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, পৃ. ২
২. ঐ, পৃ. ৩
৩. ঐ, পৃ. ৪
৪. ঐ, পৃ. ৪
৫. ঐ, পৃ. ৫
৬. ঐ, পৃ. ৯
৭. ঐ, পৃ. ১০
৮. ঐ, পৃ. ১২
৯. ঐ, পৃ. ১৭
১০. ঐ, পৃ. ১৯
১১. ঐ, পৃ. ২৪
১২. ঐ, পৃ. ৩২
১৩. ঐ, পৃ. ৩৩
১৪. ঐ, পৃ. ৩৮
১৫. ঐ, পৃ. ৪২
১৬. ঐ, পৃ. ৪৩
১৭. ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮
১৮. ঐ, পৃ. ৪৮
১৯. ঐ, পৃ. ৫২
২০. ঐ, পৃ. ৬১
২১. ঐ, পৃ. ৬২
২২. ঐ, পৃ. ৬৫
২৩. ঐ, পৃ. ৭০
২৪. ঐ, পৃ. ৭১
২৫. ঐ, পৃ. ৭৬

২৬. ঐ, পৃ. ৯১

২৭. ঐ, পৃ. ৯৩

২৮. ঐ, পৃ. ৯৭-৯৮

২৯. ঐ, পৃ. ১০৪

৩০. ঐ, পৃ. ১০৯

৩১. ঐ, পৃ. ১০৯

৩২. ঐ, পৃ. ১১০

৩৩. রায়, পারমিতা, *সোজা ব্যাটে মতি নন্দী*, মানস চক্রবর্তী (সম্পাদিত), মতি নন্দী, প্রথম প্রকাশ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৮১

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৩৫

৩৫. পাল, রবিন, *পাঠ সরণিতে মতি নন্দী*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৪৩

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

নন্দী, মতি, *স্ট্রাইকার*, প্রথম প্রকাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

সহায়ক গ্রন্থ :

চক্রবর্তী, মানস (সম্পাদিত), *মতি নন্দী*, প্রথম প্রকাশ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

পাল, রবিন, *পাঠ সরণিতে মতি নন্দী*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩